# কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার শহীদ আলতাফ মাহমুদ

আসাদুল হক

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

'জননীর স্তন্যপানের যদি কোন ঋণ থাকে, তবে তার চেয়ে বড় ঋণ আমাদের দেশ-জননীর কাছে- যার জলবায়ু ও রসধারায় আমাদের প্রাণ-মন-দেহ অনুক্ষণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।' (কুহেলিকা : নজরুল)।

দেশ ও জননীর কাছে যে বড় ঋণ, এ নিয়ে আর কতজন ভাবে। কতজনের হৃদয়-মনেই বা এমন চিন্তার উদয় হয়। সামাজিক চালচিত্রের উপর চোখ বুলালে হয়তো একজনও চোখের পর্দায় ভাসবে না। তবে সাংস্কৃতিক অঙ্গন খুঁজে বেড়ালে ন্যূনতম সংখ্যায় কয়েকজন হয়তো পাওয়া যাবে। আর তাদের মধ্যেই একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ মাহমুদ। প্রয়াত এ শিল্পীকে নানা অভিধায় পরিচয় করানো যায়। সফল মুক্তিযোদ্ধা, সফল সংগঠক, সফল সুরকার, দেশ প্রেমিক এবং একুশের গানের অমর সুরকার ইত্যাদি। তার পরিচয় যেভাবেই দেই না কেন, তিনি একুশের গানের হৃদয়স্পর্শী সুরের মাঝেই অমর হয়ে রয়েছেন। আলতাফ মাহমুদের জীবন আলোচনা তুলে ধরতে শুধু সুর ও সঙ্গীতের অঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকা যায় না। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অবদান ভুলবার নয়। তাই শিল্পীর জীবন চরিত আঁকতে তার বাল্যজীবনের কিছু কথা এখানে তুলে ধরা দরকার। কেননা প্রত্যেক গুণী ব্যক্তিত্বের বাল্যজীবনে থাকে পূর্ণাঙ্গ আলোকিত জীবনের পূর্বরাগ। এক্ষেত্রে আলতাফও ব্যতিক্রম নয়। মজার মজার সব ঘটনা, সংগ্রাম, মান-অভিমান, আর বাউন্ডুলেপনায় ভরা তার বাল্যকাল।

আলতাফ মাহমুদ বরিশাল জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তার পৈত্রিক বাড়ির পরিবেশ সম্পর্কে একটু পরিচয় অবশ্যই দেয়া দরকার। ১৯৩০ সালের ২০শে ডিসেম্বর তার জন্ম বরিশাল জেলার মুলাদী থানার অন্তর্গত পাতারচর গ্রামে। সেই ১৯৩০ সালে গ্রামের বাড়ির পারিপার্শ্বিক অবস্থান ছিল এমন- পিতা নাজেম মিয়ার নিজের ঘরটি ছিল টিনের দোতলা। ঘরের টিনগুলো ছিল লাল রং করা। ঘরের ভিটে ছিল বেশ উঁচু এবং পাকা। বাড়ির পার্শ্বেই ছিল মসজিদ। পেছন বাড়িতে ছিল পুকুর। পার্শ্বে লম্বা টিনের ঘর। এ ঘরের পাশ দিয়ে ফকির বাড়ির রাস্তা। উঠানের অপর পার্শ্বেও একটা একতলা টিনের ঘর। ঘরগুলোর বেড়াও টিনের। উঠানের মাঝখানে একটা কাঁঠাল গাছ। প্রায় পৌনে একশত বৎসর পূর্বে যে পরিবারের ঘর-বাড়ি এমন সাজানো, পাকা এবং রং করা সে পরিবার যে ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন পরিবেশেই আলতাফ মাহমুদের জন্ম। আলতাফ মাহমুদের বংশ পরিচয়- আলতাফ মাহমুদের দাদার নাম মাহমুদজান হাওলাদার। কত

সালে জন্ম আর কত সালে তাঁর মৃত্যু সে কথা জানা যায়নি। আলতাফ মাহমুদের বাবার নাম নাজেম আলী মিয়া (জন্ম : ১৮৭৬, মৃত্যু : ১৯৫৬)।

উল্লেখিত পরিচয় হতেই ধারণা করা যায় যে, আলতাফ মাহমুদের পিতা নাজেম আলী মিয়া ছিলেন বেশ স্বচ্ছল। কেননা প্রথম কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আদালতের পেশকার এবং পরে জেলা বোর্ডের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। অর্থাভাব যে ছিল না তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নাজেম আলীর চার স্ত্রী। আলতাফ মাহমুদের মা তৃতীয়। অনেক বৈমাত্রিক ভাই-বোন থাকলেও আলতাফ মাহমুদ যত্নের মধ্যেই গড়ে উঠেন। অতি শৈশব হতেই আলতাফ মাহমুদ ছিলেন চঞ্চল স্বভাবের। লেখা-পড়ায় মন বসানো ছিল খুব কষ্টের। ছবি আঁকা এবং কণ্ঠে গুণ গুণ গানের সুরই ছিল তার সহজাত অভ্যাস। জানা যায়, পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র থাকাবস্থায় উঠানের কাঁঠাল গাছে খোঁদাই করে লিখে রাখে 'ঝিলু দি গ্রেট', আলতাফ মাহমুদের ডাক নাম ছিল ঝিলু। সে কারণেই ওদের বাড়ির পরিচয় হয় ঝিলুদের বাড়ি হিসেবে। তাছাড়াও ঘরের বেড়ায়, চালে ছবি আঁকতো নির্দ্বিধায়। এ যেন ছিল তার নেশা। এ বয়সেই ঝিলুর কণ্ঠ ছিল সুরেলা। মধুর সুরে কোরআন পাঠ করে সবার মন জয় করে নিয়েছিল। এ জন্য অবশ্য ঝিলুকে শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছিল। ঘটনাটি এমন, ঝিলুর পিতা একজন ভাল ক্বারী রেখে দিয়েছিলেন ছেলেকে কোরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য। প্রতিদিন সকালে কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দিত নিয়ম মাফিক। ক্বারী সাহেবেরও ছিল সুকণ্ঠ। ক্বারী সাহেবকে অনুকরণ করতে ঝিলুর খুব বেশী কষ্টও করতে হতো না, সময়ও বেশী লাগত না। এরমধ্যে শুক্রবারের শিক্ষা ছিল ভিন্ন রকম। ঝিলু তেলাওয়াত করবে আর ক্বারী সাহেব শুনবেন। প্রয়োজনে ভুল শুদ্ধ করে দেবেন। এক শুক্রবারের তেলাওয়াত শুনে ক্বারী সাহেবতো অবাক। এমন মিষ্টি এবং চিত্তজয়ী সুরতো উনি শেখাননি। তাই প্রশ্ন করেন, 'এ সুরে কোরআন পাঠ কোত্থেকে শিখলি?' ঝিলু তখন মিষ্টি মিষ্টি হাসে। জবাব দিতে দ্বিধা করে। অনেক বলার পর ঝিলু তখনকার সময়ের বিখ্যাত এক সিনেমার গজলের কথা বলে জানায় 'আমি ঐ সুরে তালাওয়াত করেছি'। ক্বারী সাহেব থ মেরে যান। তিনি নিজের রাগ সামলাতে না পেরে ঝিলুর গালে কষে এক চড় বসিয়ে দেন এবং চলে যান। ব্যাপারটি নিয়ে বাড়িতেও নানা রকম আলোচনা হয়। ঝিলুকে মুরুবক্ষীরা গালমন্দ করেন। কিন' ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ায় না, দুপুরের দিকে আবার ক্বারী সাহেব ঝিলুদের বাড়ি এসে উক্ত সুরের প্রশংসা করে ঝিলুকে রক্ষা করেন। (সূত্রঃ আলতাফ মাহমুদঃ হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ)।

ঝিলুদের বাড়ির সামনে দুটো শান বাঁধানো বেঞ্চি ছিল। ঝিলু রাস্থার পার্শ্বের ঐ বেঞ্চিতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা মিষ্টি সুরে গান গাইত। মাঝে মাঝে রাতের বেলায়ও। ঝিলুর কন্ঠে বেশীর ভাগ সুরই ধ্বনীত হতো ভারতীয় হিট ছায়াছবির গান। খেমচাঁদ প্রকাশ, নওশাদ, রাইচাঁদ বড়াল, শঙ্কর জয়কিশন ও বরিশালের ছেলে অনিল বিশ্বাসের সুরারোপিত গানের কলিই গাইতো। (সূত্রঃ গণশিল্পী আলতাফ মাহমুদঃ বাবু রহমান)

এভাবেই ঝিলু বড় হতে থাকে, গড়ে উঠতে থাকে। বাবা এবং অন্যান্যের গালমন্দ হজম করতে থাকে হাসিমুখে। ঝিলুর এমন ভাব ও সঙ্গীতের প্রতি ঝুঁকে পড়ার জন্য অনেকেই সন্দিহান হতো ঝিলুর ভবিষ্যৎ নিয়ে। আবার রাগতো চরমে উঠে থাকত। এ ব্যাপারে কেউ কিছু বললে এবং উপদেশ দিলে ঝিলু হাসত। পরোয়া করতো কম। ঝিলুদের বাড়ির অর্থাৎ ফকির বাড়ির সংস্কৃতিসেবী ছিলেন প্রয়াত কাজী বাহাউদ্দীন আহমেদ। ডাক নাম ছিল 'তোতা'। সম্পর্কে ঝিলুর মামা। এই তোতামামা একদিন ঝিলুকে তার ছন্নছাড়া স্বভাবের জন্য উপদেশ দেন, অনেক প্রশ্ন করেন। ঝিলু তার স্বভাবসুলভ আচরণ

করে বলে ‘তোতামামা, আমি কি খারাপ ছেলে? আমি খারাপ ছেলে নই তোতামামা। দেখবেন আমি একদিন ‘ঝিলু দি গ্রেট হবো।’ ঝিলুর বাবা নাজেম মিয়া ঝিলুর স্বভাবে পরিবর্তন না আনতে পেরে সর্বদাই বিচলিত থাকতেন। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তিনিও ছেলেকে ভালবাসতেন, তা না হলে কি আর ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতেন? নাজেম মিয়ার বড় শখ ছিল ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে, ঝিলু বড় হয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার হবে। সে জন্যইতো ছেলেকে বকাঝকা করতেন। বলতেন- “বেডার কাণ্ড দেহো। ওরে আবাইগ্যা, গাছডার গায়েতো লেইখা রাখছোস- ঝিলু দি গ্রেট। গান গাইয়া কি আর গ্রেট হইতে পারবি? নামতো লেখাবী গিয়া যাত্রা বয়ানীর দলে।” (সূত্রঃ আলতাফ মাহমুদঃ হেদায়েত হোসেইন মোরশেদ)। এই ছিল শৈশবের ঝিলু।

চলায় বলায় কাজে ঝিলু হয়ে ওঠে অসীম সাহসী। গান-বাজনা, ছবি আঁকায় নির্ভয়-নিঃশঙ্কচিত। এরই মাঝে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডেও জড়িয়ে পড়েন। যেখানেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেখানেই ঝিলু। সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে উদ্যোগী কর্মী হিসেবে সে সর্বপ্রথম। সংস্কৃতির অনেক শাখাতেই সম্পৃক্ত হয়ে যান। বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থও পড়তে শুরু করেন। এসবে যখন সম্পৃক্ত, ঝিলু তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। এভাবে উত্তোরণ হতে হতে ঝিলু আর ঝিলু থাকে না, আলতাফ মাহমুদ নামেই পরিচিত হয়ে যায়। আলতাফ মাহমুদ যে একজন গুণীশিল্পী হবে তার প্রমাণ সে কিশোর বয়সেই রেখেছে। বরিশাল জেলা স্কুলের ছাত্র থাকাবস্থায়ই মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ছিল। গান গাওয়া এবং ছবি আঁকায় তখনকার ঝিলুই ছিল স্কুলে সেরা। ‘সে সময় জেলা স্কুলে সপ্তাহের একটি দিন ছাত্রদের এ্যাসেমবী’ বসতো। তাতে গান গেয়ে ঝিলু অনুষ্ঠানকে করে তুলত সরগরম। আবার স্কুলের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে কোরান তেলাওয়াতে ঝিলু সবাইকে রাখত মুগ্ধ করে। কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে তোরণ নির্মাণ ও সাজ-সজ্জার প্রয়োজন রয়েছে। সেখানেও ছিল ক্ষুদে ঝিলুর একচ্ছত্র আধিপত্য।’ এর ভিতর দিয়েই আলতাফ মাহমুদ সুর ও সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেন। এই সুর ও সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে ভাল সংগঠকও হয়ে উঠেন। যে কোন সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য তহফিল সংগ্রহের প্রয়োজনে অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। সে অনুষ্ঠান মাতিয়ে তুলত আলতাফ মাহমুদ। পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতে যেমন উদ্যোগী ছিল তেমনই পাঠক হিসেবেও ছিল মনোযোগী। বরিশালের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানে আলতাফ মাহমুদের উপস্থিতিই যেন ছিল মঞ্চে আলোকবর্তিকার বিচ্ছুরণ। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দিনটিতে বরিশাল শহরে যেসব বিজয় তোরণ নির্মিত হয়েছিল তার বেশ ক’টির শিল্প নির্দেশক ছিলেন আলতাফ। ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগস্ট দিবাগত রাত বারোটা এক মিনিটে ‘তরুণ মহফিলের’ পক্ষ থেকে স্বাধীনতা বরণের জন্য যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তার প্রথম গানের কণ্ঠশিল্পী ছিল আলতাফ মাহমুদ। ১৯৪৮ সালে কলকাতা বোর্ডের অধীনে আলতাফ মাহমুদ ম্যাট্রিক পাস করেন। ব্রজমোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন কিন্তু বেশী দিন পড়াশুনা করেননি। তবে কলকাতার আর্ট কলেজে কিছুদিন পড়াশোনা করেন এ তথ্য পাওয়া যায়। এখানেও তিনি কোর্স সম্পন্ন করেননি। তার শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে জানা যায় স্থির চিত্ত নিয়ে তিনি পড়াশুনা করেননি। জন্মগতভাবে আশৈশব থকে পারিপার্শ্বিক আবহে লালিত আলতাফের সঙ্গীতমেধা। যদিও তার বংশের আর কাউকে এ সংস্কৃতিতে পাওয়া যায়নি। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে মাঝির কণ্ঠের ভাটিয়ালী গান এবং হিন্দু মন্দিরের পূজা-পার্বনে গাওয়া কীর্তন, ভজন, শ্যামা সঙ্গীত ও খ্রীস্টান চার্চের প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর তার মনে রেখাপাত করে। পরবর্তীতে নিজের অজান্তেই সেইসব সুরে তার মনের ভাব ও ভাষাকে ছন্দায়িত করে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। জীবনকে সঙ্গীতপ্রাণ এবং সঙ্গীতজ্ঞান করেছিলেন বলেই সঙ্গীত ক্ষেত্রে এতটা দক্ষতা অর্জন

করেছেন। রাজনীতিতে যদিও আলতাফ মাহমুদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি তবুও সুরই তার আত্মপ্রকাশের প্রধান অবলম্বন। মূলত সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া, অধিকার প্রতিষ্ঠাই আলতাফের মানসলোক ঘিরে রাখত। আর সেসব কথাতে তিনি সুর বসিয়ে আরো বেশী গ্রহণযোগ্য করে তুলতেন। সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করতে এমন আর কাউকে খুব একটা দেখা যায় না আমাদের দেশে। আলতাফের সঙ্গীত গুরু মূলত প্রকৃতি, আর এতে মেধাদীপ্ত অভিব্যক্তি দিয়েছেন তিনি নিজে। কিন্তু যেসব উস্তাদদের কাছে আলতাফ তালিম নিয়েছেন তাঁদের কথা অসাধারণ নম্রতায় উচ্চারণ করেছেন বার বার। এতে তিনি অন্যকে যেমন বড় করেছেন নিজে হয়েছেন অসাধারণ মহিমান্বিত। এমন দুর্লভ গুণের সমাবেশ খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়।

এছাড়া আলতাফ মাহমুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথা কোন গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা নিবন্ধে পাওয়া যায় না। তবে এ সময়টাই শিল্পীর সঙ্গীত শিক্ষার, রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার, নানান সংগঠনে যুক্ত হওয়ার উজ্জ্বল পর্ব বলা চলে। ১৯৪৮-এ ম্যাট্রিকের ফলাফল প্রত্যাশা অনুযায়ী সন্তোষজনক না হওয়ায় তার বাবা মারাত্মকভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে। বাড়িতে গেলে এ নিয়ে শত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। উচ্চ-বাচ্য শুনতে হবে। তাতে মনও বিষিয়ে উঠবে। এমন ভেবে বাড়িতে না গিয়ে কীর্তনখোলা নদীর তীরে বেলাপার্কের কাছে বেঞ্চিতে বসে বন্ধুদের নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে সময় কাটান। গানের পর গান চলতে থাকে। সায়গল, রাইচাঁদ, কানাকেষ্ট, জ্ঞান গোসাই, কে মল্লিক, কমলা ঝরিয়া এমন নামকরা শিল্পীদের কণ্ঠের গান নিজের কণ্ঠে গেয়ে নিজের কষ্ট ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন। এরপর হতে সঙ্গীতের পথে সামনে চলা ছাড়া আর পিছনমুখী হতে হয়নি তাঁকে। ১৯৪৫-৪৬ সালে ‘তরুণ মহফিল’-এর একজন উৎসাহী কর্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে ‘ধুমকেতু শিল্পী সংঘ’-এর সাথে শিল্পী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সংগঠনের পরিচালক ছিলেন বগুড়ার নিজামুল হক। নিজামুল হকের পরিচিতি ছিল গায়ক, সংগীত পরিচালক, নৃত্যপরিচালক এবং নৃত্যশিল্পী হিসেবে (সূত্রঃ আঃ মাঃ/হেঃ হোঃ মোর)। প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালে শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত আলতাফ মাহমুদের স্মরণসভায় নিজামুল হক-এর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, আলতাফ মাহমুদের সাথে তার প্রথম পরিচয়ের পর্বের কথা। তিনি বলেছেন, ‘একদিন, সেদিনের কথা ভোলা যায় না, ভুলতে পারবো না কোনদিন।’ আমার এক বন্ধু আমার কাছে এসে বললো, ‘নিজাম, বরিশাল থেকে ঝিলু নামে একটি ছেলে এসেছে। ভালো বেহালা বাজায়। তোমার তো এমন শিল্পীর দরকার। তাকে নাও না দলে। সত্যি বলতে কি, তখন আমি এমন এমেচার খুঁজে বেড়াতাম। কোন এমেচার শিল্পীর খোঁজ পেলেই শিকারী বাঘের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে এসে ভিড়াতাম আমাদের সংগঠনের মধ্যে। আমাদের কোন শিল্পীকে কিছুই দেবার ছিল না, ছিল শুধু বুক ভরা ভালোবাসা। যা আমরা একে অন্যকে বাটতাম। আর প্রতিজ্ঞা করতাম দেশ গড়ার অনমনীয় কঠোর সংকল্প। তাই সেদিন ঝিলুর কথা শুনে প্রচণ্ড উৎসাহ পেলাম মনে মনে। বললাম তাকে নিয়ে এসো একদিন।’ তোমার কথা ভেবে আমি সাথে করে নিয়েই এসেছি। বসে আছে বাইরে চায়ের দোকানে। ‘ওখানে কেন, এখানে নিয়ে এসো।’ তাকে নিয়ে এলো। ছাই রঙের প্রিন্সকোট গায়ে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, আমার থেকে একটু লম্বা, কালো মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে, হাতে বেহালার বাক্স। সৌম্য শালীন ভদ্র চেহারার একটি মানুষ এগিয়ে আসছে।

আমার দিকে। মনে হলো, কত যেন চেনা, কত যেন আপনার। মুখে মিষ্টি হাসি দিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে দিল। আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম আপনিই বুঝি ঝিলু। হ্যাঁ ঝিলু আমার নাম, ডাকনাম। কিন্তু বাবা-মা নাম রেখেছেন, ‘আলতাফ মাহমুদ’। বুঝতে পারলাম ছোট্ট নামের আড়ালে লোকটি লুকিয়ে

থাকতে নারাজ। বৃহত্তরের আশা, বড় হওয়ার কল্পনা- নাম বলার মাঝেই প্রকাশ করলেন। বুঝলাম বড় হবার সংকল্প জমাট হয়ে আছে তাঁর বুকের ভেতর।

আমরা সবাই এক জায়গায় বসলাম। তিনি বাজিয়ে শোনালেন 'মিয়াকী টৌরী'। অসম্ভব মিষ্টি তাঁর হাতখানা, দরদভরা ছড়ের টানে টানে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর বুকের বোবা কথাগুলো। দু'চোখ তাঁর বন্ধ, যেন হারিয়ে গেছে কোন এক অজানা দেশে। মুগ্ধ হয়ে শুনলাম তাঁর বেহালা। সুর থেমে গেছে ভাবছি অনেক কথা। সম্বিত ফিরে পেলাম আলতাফের ডাকে কি চুপ করে আছেন যে।? চমকে উঠলাম আমি, বললাম আমতা, আমতা করে। 'আপনি তো আমাদের সাথে থাকবেন না।' কেন, পাল্টা প্রশ্ন আলতাফের। আপনি শিল্পী, আরো বড় শিল্পী হতে চান। সুযোগ পেলেই চলে যাবেন আমাদের ছেড়ে। আমরা যা কিছু করি তা দিয়ে শুধু ভালবাসাই পাই। আর কিছুই নয়'। -যারা ভালবাসা পায়, তারা কি ভাত খায় না, খায়। বাস, ওটুকুই আমার চাই আর কিছু নয়, আমি শুনেছি আপনার সংগঠনের কথা। এমনি একটি সংগঠনের খোঁজ আমি করছিলাম। যারা মানুষকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দেয়, স্বীকৃতি দেয় শ্রষ্টার সৃষ্টিকে। 'তা হলে আপনি আমাদের সংগঠনের শিল্পী?' জোরে করমর্দন করে বললেন, নিশ্চয়ই। মেট্রিক পাস করার পরে বরিশালে বাটা কোম্পানীতে চাকুরী করছিলাম আর বেহালা শিখতাম সুরেণ বাবুর কাছে। কিছুই ভাল লাগে না। মন যা চায় তা পাই না বরিশালের গন্ডির মধ্যে। তাই বেহালা আর মায়ের হাতের কাঁথাখানা নিয়ে চলে এলাম ঢাকায়। জুলফিকারের সাথে দেখা হতেই আপনার কথা বললো- চলে এলাম এখানে। আমার ধারণা ছিল আপনি হবেন গম্ভীর, ইয়া লম্বা-চওড়া মোটাসোটা অসম্ভব মেজাজী একটা লোক। কিন্তু এখন দেখছি আপনি আমার চেয়ে ফুচকা। অনেক বেলা হলো, এবার উঠার পালা। সকাল থেকে দু'কাপ চা ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি। জিজ্ঞেস করলাম অলতাফকে আছেন কোথায়, কোন ঠিক নেই। দু'দিন হয় ঢাকায় এসেছি, দেখি কোন মেসেটেসে ব্যবস্থা করা যায় কি না। আমি থাকতাম তখন সেন্ট্রাল রোডে, যদিও ছাত্র তবু সংগঠনের খাতিরে বাসা ভাড়া করতে হয়েছিল। বললাম, আমার একটা হোটেল আছে নাম 'হারাধনের হোটেল'। আ বা ফ্রি- মানে আহার-বাসস্থান ফ্রি। ইচ্ছে করলেই আমার ওখানে থাকতে পারেন। চিৎকার করে উঠলেন আলতাফ- 'আহ ব্রেভো' পানি না চাইতেই বৃষ্টি। কিন্তু একটা কথা, এই আপনার আপনি আপনি সম্বোধনটা আমার ভাল লাগছে না,- বলো তুমি, হ্যাঁ, হ্যাঁ,- বলো তুমি।' হেসে বললাম, হ্যাঁ তুমি। বাসায় এসে পরিচয় করিয়ে দিলাম। মুনিম, জাহান আরা লাইজু, শাহাদাতের সাথে। ছোট্ট লাইজু আলতাফকে অনেকক্ষণ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললো- 'ও নিজাম ভাই এ যে দেখছি আপনার মতোই পাগলা গো।' আলতাফ হেসে লাইজুকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'আমরা সব পাগলা, পাগলী এক হয়েছি দেশকে করবো জয়- মোদের কি বা আছে ভয়।' সত্যিই আলতাফ ছিল নির্ভীক, তাই সে সকল ভয়কে জয় করেছে, আর জয় করেছে আমাদের হৃদয়কে। আলতাফ এসেছিলেন সংগঠনের একজন বেহালাবাদক হিসেবে কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে প্রমাণ করলো তাঁর প্রতিভা, অবিস্মরণীয় কল্পনাশক্তি, সুরের নিপুণিয়তা, অর্কেস্ট্রেশনের গাঁথুনি প্রক্রিয়া, সংগঠনের প্রতি একাগ্রতা। সে স্থান করে নিলো সংগঠনের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে।

ধূমকেতু শিল্পী সংঘের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ার পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অন্য শিল্পীদের সাথে আলতাফ মাহমুদকেও যোগ দিতে হয়। প্রথমদিকে শিল্পী বেহালা বাজাতেন। হঠাৎ একদিন একাকি বাসায় আলতাফ গলা ছেড়ে গান ধরে 'ম্যায় ভুখা হুঁ'। এমন সময় নিজামুল হক ঘরে ঢুকেন। আলতাফ মাহমুদের কণ্ঠ শুনে নিজামুল হক অভিভূত হন। নিয়ে যান ঢাকা হলে তাঁর বড় ভাই

গাজীউল হকের কাছে। সেখানে আবারও একই গান 'ম্যায় ভুঁখা হুঁ' গেয়ে শুনাতে হয়। কিছুদিন পর কার্জন হলের এক অনুষ্ঠানেও একই গান গেয়ে শোনান আলতাফ মাহমুদ। এরপর চারিদিকে আলতাফের জয়জয়কার পড়ে যায়। যেখানেই অনুষ্ঠান সেখানেই আলতাফের কণ্ঠ। ভারতে গণনাট্য সংঘ ও প্রান্তিকের গান ধূমকেতুর শিল্পীরা গাইতেন, সেখানেও আলতাফ। এরপর 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' সংগঠনের সাথেও সম্পৃক্ত হতে হয়। যুবলীগের সাংস্কতিক ফ্রন্টের নেপথ্য নায়ক হিসেবে প্রথমদিকে ছিলেন। ১৯৬৪ সাল। চাকরির কারণে আমাকে করাচী অবস্থান করতে হয়েছে। নিজামুল হককে তখন প্রথম দেখি। কোন এক সময় আমরা পাকিস্তান কোয়ার্টারে পাশাপাশি বসবাস করতাম। কথা প্রসঙ্গে তখন তিনি প্রায়ই আলতাফ মাহমুদের কথা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন। কিন্তু আমি তখন গুরুত্ব দিয়ে শুনিনি। কোন্ কোন্ দিন পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের রেডিও থেকে আলতাফ মাহমুদ গান প্রচার করতেন একথাও আমি নিজামুল হকের কাছেই জানতে পারি। মনে পড়ে, আমার প্রথম করাচী রেডিও স্টেশন থেকে যে গানটা প্রচারিত হয়েছিল সেটি ছিল কাজী নজরুলের একটি ইসলামী গান। কিন্তু সুরটি ছিল বাংলাদেশের ভাটিয়ালী। আমার প্রচারিত এই গানটি রেডিও থেকে আগের দিন রেকর্ড করে নিয়েছিল। রেকর্ড শেষে প্রডিউসার (পুরো নাম এখন আমার মনে নেই তবে তাকে আমরা ডাকতাম মি. তিরমিজি বলে) আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি কি আলতাফ মাহমুদের ছাত্র ছিলে? আলতাফ মাহমুদ এইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ভাটিয়ালী গান গাইত'। এই মি. তিরমিজির কথা শুনে আমার মনে হয়েছে, হয়ত নিজামুল হক আলতাফ মাহমুদের যে প্রশংসা করতেন তা যথার্থই। আমি ১৯৫২ সালে যখন চাকরির কারণে কলকাতা চলে যাই, যাবার আগে ঢাকা ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে পাতলা খান লেনে লুৎফর ভাইয়ের বাড়িতে প্রথম আলতাফ মাহমুদকে দেখি। কিন্তু তখন তার গান শুনিনি। আবার ১৯৬৪ সালে যখন কলকাতা থেকে বদলি হয়ে করাচি আসি তখন আলতাফ মাহমুদ ঢাকা চলে আসেন। তাই এই শিল্পীর গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আজ এই শিল্পীর বিষয়ে আমাকে এ ক'টি কথা উল্লেখ করতেই হলো।

ধুমকেতুর সংগঠক ও নৃত্য পরিচালক নিজামুল হক, সংগীত পরিচালক মোসলেউদ্দীন ও সহকারী সঙ্গীত পরিচালক আলতাফ মাহমুদ। পরবর্তীতে মোসলেউদ্দীন চলে যাওয়ার পর আলতাফ মাহমুদ হন সঙ্গীত পরিচালক। এই সংগঠনের শিল্পীরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা সাংস্কৃতিক সফর করতেন। সেখানে প্রশংসার উচ্চমার্গে থাকতেন আলতাফ মাহমুদ এবং নিজামুল হক। লুৎফর রহমানের থেকে জানা যায়, 'এই সময় আলতাফ মাহমুদের কণ্ঠ এত দরদী আর এত আমেজ ছিল যে, সেই কণ্ঠের সাথে আজও কারো কণ্ঠের তুলনা করতে পারি না (সূত্রঃ জীবনের গান গাই- শেখ লুৎফর রহমান, পৃঃ ৪৭-৪৮)। এ সময়কালের প্রখ্যাত সুরকার মোসলেউদ্দীন, বগুড়ার জাহানারা লাইজু (জানু), শাহাদাত (টুকু), নওগাঁর মোমিনুল হক (ভুটি ভাই) সবাই হয়ে ওঠে এক প্রাণ এক পরিবারের সদস্য। ১৯৫০-এ ঢাকা এসে ১৯৫২ পর্যন্ত 'কবিতা, গান, নাটক, নৃত্যনাট্য, ছায়ানাট্যসহ শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে (আলতাফ মাহমুদের) চল্‌ল সাংস্কৃতিক চর্চা।' (সূত্রঃ গঃ শিঃ আঃ মাঃ/বাবু রহমান)) এভাবেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং শিল্পীদের বিস্তার লাভের মাধ্যমে আলতাফ মাহমুদের সুর করা গানের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

দেখতে দেখতে চলে আসে বায়ান্ন সাল। এ সালের ফেব্রুয়ারী মাসটি বাংলার ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক মাইল ফলক। বললে বেশী বাড়িয়ে বলা হবে না যে, বায়ান্নর ফেব্রুয়ারিতে ভাষা সৈনিকদের রক্তদানের মাধ্যমে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয় তার ফসল আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। এই বায়ান্নতে সঙ্গীত শিল্পী আলতাফ মাহমুদ একজন প্রত্যয়ী যুবক। শিল্পী তখন ঢাকাতে যেমনই ব্যস্ত তেমনই পরিচিত।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এ শিল্পীর সক্রিয় ভূমিকা থাকাই স্বাভাবিক এবং ছিলোও। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং ফেব্রুয়ারিতে বাঙালীর আত্মদান এ দেশের সংস্কৃতির ধারাই পাল্টে দেয়। প্রায় এক যুগেরও বেশী সময় ধরে স্বাধীকারের লক্ষ্যে সংস্কৃতির নবধারা গণমাধ্যমগুলোতে নবযুগের সূচনা করে। জন জাগরণের লক্ষ্যে, উজ্জীবিত হওয়ার লক্ষ্যে, মাতৃভূমি পাঞ্জাবী শাসনমুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে, দেশ ও জনগণকে স্বাধীনতার সুফল দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নজরুলী আদর্শের ভাবধারা প্রবাহিত হতে থাকে। সৃষ্টি হতে থাকে নতুন নতুন সঙ্গীত ও সুর। যে সুরের আবহে, কথার আকর্ষণে বাংলার জনগণ সঙ্গীতের দিকে উচ্চকিত দৃষ্টি ফেরায়। বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির পর বছরগুলোতে সংগ্রামের কণ্ঠস্বর রণিত-ধ্বক্ষনিত হতে থাকে বাংলার আকাশে-বাতাসে। ভাষা আন্দোলনে আব্দুল মতিন, মাহাবুবুল হক চৌধুরী, গাজীউল হকদের পাশাপাশি আলতাফ মাহমুদ, আব্দুল লতিফ, শেখ লুৎফর রহমান, নিজামুল হকদের নাম কৃতজ্ঞতার সাথেই স্মরণ করতে হয়। এর মধ্যে যে নামটি চির উজ্জ্বল, চির অমর এবং বার বারই উচ্চারিত হয় এবং হবে, সে নাম-আলতাফ মাহমুদ। কারণ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে গাওয়া গানের সুরকার তিনি। মূলতঃ বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষার জন্য অকাতরে প্রাণদান করে যে বীজ বপণ করে যায় তার ফসল সাংস্কৃতিক জগতেই বেশী পাওয়া যায়। শহীদের রক্ত বাহিত সংগীত যেমন সৃষ্টি হয় তেমন হৃদয়কাড়া সুরও সৃষ্টি হয়। সে সময় অনেক সংগীতকার ও সুরকার জন্ম নিয়েছেন, প্রখ্যাতও হয়েছেন। তাদেরই অন্যতম আলতাফ মাহমুদ। শিল্পীর কণ্ঠ বিচারে শেখ লুতফর রহমান বলেন, "৬৭ সালের ফেব্রুয়ারীর ২১, ২২ ও ২৩ তারিখ- এই তিনদিন পল্টন ময়দানে তাদের উদ্যোগে লাখ লাখ জনতার উপস্থিতিতে 'জ্বলছে আগুন ক্ষেত- খামারে' শীর্ষক যে গীতি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয় তা অসীম উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলো সেদিন জনমনে। এই অনুষ্ঠানে আলতাফ মাহমুদ যে গানটি তাঁর দরদি গলায় উদাত্তকণ্ঠে গেয়েছিলেন, বহু মানুষের কাছে আজো তা একটা স্মরণীয় ঘটনা। গানটি ছিলো, 'ও বাঙ্গালী, ঢাকার শহর রক্তে রাঙ্গাইলিঃ।' আজো এ গান গাওয়া হয়, কিন্তু আলতাফের মতো করে কেউ আর কোনোদিন গাইতে পারবে বলে মনে হয় না।"

একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসের প্রথম বার্ষিকী উদযাপিত হয় ১৯৫৩ সালে। এই দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়েই বাংলার মানুষ জানতে পারে সংস্কৃতির নব উত্থান এবং দেখতে পায় স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার স্বপ্নময় নব সিঁড়ি। কত জ্বালাময়ী সংগীত, কত হৃদয়গ্রাহী সুর, কত কবিতা, কত নাট্য, কত বিবৃতি- আলোচনা এ পরিচয় ১৯৫৩ সালের শহীদ দিবসে প্রথম বার্ষিকীতে আমরা পাই। সে সময়কার জাগরণী গানের মধ্যে নাম করা যায় অনেক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন :

'রাষ্ট্র ভাষার আন্দোলন করিলিরে বাঙ্গালী

ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি।'

গানটির রচয়িতা ও সুরকার শামসুদ্দীন হলেও, এই গানের সুরটিও সুন্দর করে ঢেলে সাজিয়েছেন মরহুম আলতাফ মাহমুদ।

---

আসাদুল হক, ঢাকা, ১৭/১২/২০০৮